বড় গল্প

নিরীক্ষণ

রাকিব মোল্লাহ্

'তা হলে লোভের অস্তিত্ব যে সবার হৃদয়ে রয়েছে, এ কথা তো প্রমাণিত হলো, রাজন।'

কৈলাস ব্রাহ্মণ স্নান সেরে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ দিঘির জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। অবশ্য দুয়েক বার পানিতে ডুব দেয়ার পরেই তাপমাত্রা গা সওয়া হয়ে যায়। তবু সকাল হওয়ায় তার শীত শীত করতে লাগল।

হঠাৎ খেয়াল হলো, পৈতেটা আর গলায় নেই। তার কপাল সামান্য কুঁচকে গেল। এই পৈতেটা কৈলাস যখন রাজ্যের প্রধান পুরোহিত হয়, তখন রাজা সত্যেন্দ্রনাথ তাকে বানিয়ে দিয়েছিলেন। মূল্যবান জিনিস, হারানো চলে না। ঘাটের কাছেই ডুব দিয়েছিল সে কয়েক বার। ওখানেই পড়ে যাওয়ার কথা। পৈতা পুনরুদ্ধারের জন্য সে ফের পানিতে প্রবেশ করল।

খানিকক্ষণ হাতড়েই পেয়ে গেল কাঙ্ক্ষিত বস্তু। ঘাটে ফিরে এল সে চিন্তামুক্ত হয়ে। এমন সময় তার চোখ পড়ল রাজা জিতেন্দ্রনাথের দিকে। জিতেন্দ্রনাথ গালে হাত দিয়ে দিঘির জলের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবনায় আচ্ছন্ন। তাকে দেখে কৈলাসের কপাল পুনরায় কুঞ্চিত হয়ে গেল।

জিতেন্দ্রনাথ রাজা হয়েছে, আজ প্রায় বছর দশেক। রাজা সত্যেন্দ্রনাথের ছয় সন্তানের মধ্যে সবার বড় জিতেন্দ্রনাথ। তাই পিতার মৃত্যুর পর সে-ই সিংহাসনে বসে। অবশ্য আর কোন দাবিদার ছিল না সিংহাসনের। কেননা, সত্যেন্দ্রনাথের চার পুত্রের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়েছিল ছোটবেলাতেই। দুই কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে। আর জিতেন্দ্রনাথের অভিষেকের সময় তার কনিষ্ঠ

কৈলাস ব্রাহ্মণ স্নান সেরে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ দিঘির জল অত্যন্ত ঠান্ডা। অবশ্য দুয়েকবার পানিতে ডুব দেবার পরেই তাপমাত্রা গা সওয়া হয়ে যায়। তবু সকাল হওয়ায় তার শীত শীত করতে লাগল।

হঠাৎ খেয়াল হল পৈতেটা আর গলায় নেই। তার কপাল সামান্য কুচকে গেল। এই পৈতেটা যখন কৈলাস রাজ্যের প্রধান পুরোহিত হয়, তখন রাজা সত্যেন্দ্রনাথ তাকে বানিয়ে দিয়েছিলেন। মূল্যবান জিনিস, হারানো চলে না। ঘাটের কাছেই ডুব দিয়েছিল সে কয়েকবার। ওখানেই পড়ে যাবার কথা। পৈতা পুনরুদ্ধারের জন্য সে ফের পানিতে প্রবেশ করল।

খানিকক্ষণ হাতড়েই পেয়ে গেল কাঙখিত বস্তু। ঘাটে ফিরে এল সে চিন্তামুক্ত হয়ে। এমন সময় তার চোখ পড়ল রাজা জিতেন্দ্রনাথের দিকে। জিতেন্দ্রনাথ গালে হাত দিয়ে দিঘির জলের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবনায় আচ্ছন্ন। তাকে দেখে কৈলাসের কপাল পুনরায় কুঞ্চিত হয়ে গেল।

জিতেন্দ্রনাথ রাজা হয়েছে আজ প্রায় বছর দশেক। রাজা সত্যেন্দ্রনাথের ছয় সন্তানের মধ্যে সবার বড় জিতেন্দ্র নাথ। তাই পিতার মৃত্যুর পর সেই সিংহাসনে বসে। অবশ্য আর কোন দাবিদার ছিল না সিংহাসনের। কেননা সত্যেন্দ্রনাথের চার পুত্রের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয়েছিল ছোটবেলাতেই। দুই কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে। আর জিতেন্দ্রনাথের অভিষেকের সময় তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বয়স ছিল মাত্র এক বছর। এই বয়সে আর যাই হোক রাজ্যশাসন করা চলে না। তবে কৈলাশের ধারণা হয়ত কনিষ্ঠ ভ্রাতাই এক সময় রাজ্যের হাল ধরবে।

এ ধারণার প্রধান কারণ জিতেন্দ্র নাথের রাজকার্যে অনীহা। সত্যেন্দ্র নাথ এ অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন প্রায় ত্রিশ বছর। রাজকার্য এর প্রয়োজনে তিনি যেমন ছিলেন নিষ্ঠুর, তেমনই আবার উদার। কিন্তু এই দশ বছরেও রাজার মতো আচরণ তার পুত্র জিতেন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা যায়নি।

সিংহাসনে বসে থাকা মানুষের প্রধান কাজ হল- যারা সিংহাসনে বসে নেই- তাদের মনে ভয় সৃষ্টি করা, এমনটাই কৈলাস বিশ্বাস করে। একবার ভয়ের বীজ বপন করতে পারলে তা থেকে যেই চারা জন্ম নেয়- সেটা হল শ্রদ্ধা। আর ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা কোন নেতা যদি অর্জন করতে না পারে তাহলে তাকে পদে পদে রাজকার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হতে হয়।

জিতেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যা হচ্ছে। প্রজাদের প্রতি তার অতিরিক্ত দয়া। সে সম্ভবত ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার বদলে ভালোবাসা মিশ্রিত শ্রদ্ধা অর্জন করতে চায় প্রজাদের কাছ থেকে। তবে দারিদ্র্যের অভিশাপ দোর দিয়ে প্রবেশ করলে ভালোবাসার আশীর্বাদও যে এক সময় খিড়কি দিয়ে পালিয়ে যায়- এ কথা হয়ত জিতেন্দ্রনাথ বুঝতে পারে নি।

পারবেই বা কিভাবে। জিতেন্দ্রনাথের মন তার স্ত্রী রমাদেবীর কাছে এখন প্রায় নিয়ন্ত্রণাধীন বললে ভুল হয় না। মেয়েটির মাঝে সূক্ষ্ম কূটনৈতিক কোন চিন্তার বালাই নেই। পৃথিবীকে সে দেখে সরল চোখে। এবং এই চোখে শুধু ধনীরাই দোষী। আর দরিদ্র এখানে নিষ্পাপ। জিতেন্দ্রনাথের মধ্যেও ধীরে ধীরে এই বোধ প্রবল হচ্ছে।

এইত সপ্তাহ খানেক আগে, কয়েকজন কৃষক এসেছিল ফসলের উপর থেকে কর কমানোর জন্য। তারা হাতজোড় করে কাঁপা কাঁপা গলায় করুণ এক আকুতি জানাল। তাদের কথা হচ্ছে যেহেতু এ বছর বন্যা হয়েছে, তাই আগের নির্ধারিত কর দেওয়া আর সম্ভব নয়, বলতে বলতে কয়েকজন চোখের জলও ফেলল।

জিতেন্দ্র নাথের চোখও যেন আষাঢ়ের মেঘের মত জলসঞ্চার করল।

কৈলাশ এবং বাকি সভাসদেরা খুবই কষ্ট করে, খানিকটা জিতেন্দ্রর সাথে তর্ক করে, সে যাত্রায় কর হ্রাসের ব্যপারটি এড়িয়ে যায়।

রাজকোষের অবস্থা ভালো নয়, চারিদিকেও বহিঃশত্রুর আনাগোনা— এমন পরিস্থিতিতে কৈলাস ব্যাকুলভাবে চাইছিল জিতেন্দ্রনাথ পাশের রাজ্যের রাজকন্যা হিরন্ময়ীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোক। কারণ সে রাজ্যের জামাতা হিসেবে বিপুল সম্পদ এবং কূটনৈতিক সুবিধা জিতেন্দ্রনাথ অনায়াসেই পেয়ে যেত। কিন্তু জিতেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে বেঁকে বসেছে, সে এখনও একটি মাত্র স্ত্রী রাখার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। সে বুঝতে পারে না যে, রাজনীতির মাঠে ভালোবাসার কোন স্থান নেই।

একজন রাজার পক্ষে রাজকার্য ভুলে থাকা যে অসম্ভব বিলাসিতা, তা জিতেন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেওয়াটা এখন কৈলাসের কাছে জরুরি হয়ে উঠেছে।

কৈলাস কয়েক পা এগিয়ে এসে জানতে চাইল, "রাজন, আপনার অন্তর বিমর্ষিত মনে হচ্ছে।"

জিতেন্দ্রনাথকে দেখে মনে হলো, সে খানিকটা লজ্জা পেয়েছে। তাদের শৈশব কেটেছে একসাথেই, রাজগুরুর পাঠশালায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। কৈলাসের বাবা ছিলেন রাজ উপদেষ্টা; তার মৃত্যুর পর সেই পদভার এসে পড়েছে কৈলাসের কাঁধে। জিতেন্দ্রনাথও পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেছে। কৈলাস বরাবরই গণিত ও যুক্তিতে পারদর্শী ছিল, ঠিক যেমন জিতেন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল শিল্পকলার দিকে। চতুরঙ্গ খেলায় কৈলাশ ছিল ভীষণ পারদর্শী, তাই জিতেন্দ্রনাথ তাকে গভীরভাবে পছন্দ করত। কিন্তু তার শিল্পের প্রতি অনীহা এবং দরিদ্রের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করার জন্য জিতেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তার উপর বিরক্তও হত।

সে বলল, "কৈলাস, তোমাকে কতবার বলেছি, একান্তে তুমি আমার নাম ধরেই ডাকবে।"

কৈলাস হেসে বলল, "তা কি হয়, রাজন? আপনি এ রাজ্যের শিরোমনি, আর জিহবা দিয়ে শির স্পর্শের চেষ্টা সমীচীন নয়।"

জিতেন্দ্রনাথ হেসে ফেলল, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল। সে বলল, "প্রজাদের দুঃখে আমার অন্তরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে কৈলাস। ওদের থেকে কর আদায় করতে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। ওদের সরল মুখ দেখলে আমার মায়া হয়।"

কৈলাস বলল, "মুখ দেখে কাউকে সরল মনে করবেন না, রাজন। ছোট পিঁপড়েও যেমন তার দংশনে তীব্র জ্বালা সৃষ্টি করে, তেমনই কিছু মানুষও সরলতার আড়ালে হিংস্রতা লুকিয়ে রাখে। গরিব প্রজাদের অবস্থা আর বড়লোকদের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য নেই। উভয়ের মাঝেই অলসতা, লোভ এবং অসততা থাকতেই পারে।"

জিতেন্দ্রনাথের ভুরু কুঁচকে উঠল, চোখে স্পষ্ট অবিশ্বাস। "কোনো নিরীক্ষা ছাড়াই এমন কথা বলা ঠিক নয়, কৈলাস।"

হঠাৎই কৈলাসের চোখে বুদ্ধির ঝিলিক খেলে গেল। সে সোজা হয়ে বসল, মুখে কৌতুক আর দৃঢ়তার অদ্ভুত মিশ্রণ। "ঠিক আছে, রাজন, নিরীক্ষার কথাই যখন বলছেন, তখন না হয় একটা নিরীক্ষা হয়ে যাক।" তার দৃষ্টি এখন জিতেন্দ্র নাথের উপর নিবদ্ধ, সকৌতুকে বলল, "আমি তিনজন ধনী লোক এবং তিনজন গরিব লোক নিয়ে একটা মনস্তাত্তিক খেলা খেলব। যদি খেলাটিতে কমপক্ষে দুইজন দরিদ্র লোক বিজয়ী হয়, অর্থাৎ তাদের সরলতা যদি প্রমাণিত হয়- তাহলে আমি মেনে নেব যে তাদের সাথে আসলেই অন্যায় হচ্ছে। তাদের কর আমি অর্ধেক করে দেব।"

জিতেন্দ্রনাথের মুখে এক চিলতে হাসি ফুটল। "যথার্থ বলেছ," তার কন্ঠস্বরে ছিল চাপা প্রত্যয়। "তবে একটি শর্ত আছে, রাজন।" কৈলাস ধীরে ধীরে বলল, তার চোখে তীক্ষ্ণতা। "আর যদি প্রমাণিত হয় যে আমিই সঠিক, তাহলে আপনি রমাদেবীকে এক বছরের জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন, আর হিরন্ময়ী দেবীকে বিবাহ করবেন।"

জিতেন্দ্রনাথ বাক্যহারা হয়ে কৈলাসের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখে ছিল অবিশ্বাস, আর একরাশ দ্বিধা। সে হ্যা বা না কিছুই বলল না। দিঘির জল তখন শান্ত, কিন্তু তাদের দুজনের মাঝে উত্তেজনার ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করল।

প্রথম পরীক্ষা

শঠতা, আর লোভ এমন এক আগ্নেয়গিরি যার লাভা মানুষের মুখের কথা আর চোখের দৃষ্টি এ দুই দিয়েই নির্গত হয়। কৈলাশ ছোটবেলা থেকেই আরেকজন মানুষ কি ভাবে চিন্তা করে, তা গভীরভাবে খেয়াল করে এসেছে। আজকাল তাই কারো চোখে চোখ রাখলেই তার ভিতরের অবস্থা আঁচ করতে তার সমস্যা হয় না।

চতুরঙ্গ খেলবার সময় কৈলাশ মনে মনে যেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে থাকে, এবারো ঠিক সেভাবেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিল। তিনজন দরিদ্র মানুষকে সে বেছে নিল- একজন মাঝি, একজন বংশীবাদক, একজন ভিখারি। বিজয়ী হলে যে তারা পুরস্কার পাবে এ কথা বলা হল তবে পুরস্কারের পরিমাণ উল্লেখ থেকে বিরত রইল কৈলাশ।

বেশ কিছু বণিক এসেছিল রাজার কাছে কিছু ব্যবসায়িক সুবিধার আশায়। কৈলাশ তাদের মধ্য থেকেই তিনজনকে বাছাই করল নিরীক্ষণ এর জন্য। তাদের জানিয়ে দিল, মনস্তাত্ত্বিক এ খেলায় জয়ী হতে পারলে সকল ব্যবসায়িক সুবিধা দিয়ে দেওয়া হবে।

কৈলাশ অনেক ভেবে তিনটি মনস্তাত্ত্বিক খেলা বের করল নিরীক্ষণের জন্য। আর নিরীক্ষণ শুরু হবার আগে আগে পূজা সেরে নিল। যতই নিজের বিচারবুদ্ধির উপর আস্থা থাকুক না কেন, দৈব শক্তির সাহায্য ছাড়া যে কোন কিছু সাধন করা যায় না- এ কথা কৈলাশ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

প্রথম নিরীক্ষণের জন্য দরিদ্র এক মাঝি আর এক সওদাগর কে বেছে নেওয়া হল। চোখে কৌতুহল আর মনে আশংকা নিয়ে দুরু দুরু বুকে প্রতিযোগিরা ঘাটে এসে উপস্থিত। সওদাগর ভয় পেয়েছে বেশি। কারণ সে সাঁাতার জানে না।

রাজা জিতেন্দ্রনাথ ঘাটে এসে দাঁড়ালেন, সংেগ রানি রমাবতী। রানিকে দেখতে পেয়ে কৈলাশ কিছুটা বিরক্ত হল। এই মেয়েটিই আজ জিতেন্দ্রনাথের মতিভ্রমের জন্য দায়ী। যেকোনো দুটি নিরীক্ষণের ফলাফল কৈলাশের দিকে চলে আসার পর, একে রাজপ্রাসাদ থেকে কৌশলে বের করে দেওয়া যাবে। কৈলাশ সেই ক্ষণের প্রতীক্ষা করতে লাগল মনে মনে।

কৈলাশ জিতেন্দ্রনাথের কাছ থেকে খেলা শুরুর অনুমতি নিয়ে প্রতিযোগীদের সামনে এসে খেলার নিয়ম জানিয়ে দিল।

-তোমাদের খেলা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে। এ খেলায় কোন হারজিত নেই। তোমাদের কাজ হবে নদী দিয়ে নৌকা বেয়ে পাশের কয়েকটি ঘাট থেকে কিছু জিনিস নিয়ে আসা। কোন কোন ঘাট থেকে আনতে হবে তার একটা তালিকা আমি সওদাগরের হাতে দিয়ে দিচ্ছি। চিন্তা নেই, তোমরা ভালো পুরস্কার পাবে। যেই মালামালগুলো তোমরা ঘাট থেকে উত্তোলন করবে, তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ভাগ করে নেবে।

ছইয়ের মধ্যে খানিকটা জলখাবার নেবার পর নৌকা ছাড়া হল। মাঝি বৈঠা বাইতে বাইতে গান ধরল। তার চোখ চকচক করছে। কি ধরনের মালামাল সে পেতে পারে সেই মধুর ভাবনায় তার কল্পলোক তখন আচ্ছন্ন।

অন্যদিকে সওদাগরের তখন প্রচন্ড দুশ্চিন্তা, ছোটবেলা থেকে পানির প্রতি এক অদম্য ভয় তার মনে। এজন্য সাঁতারটাও শেখা হয় নি I তাই বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস বুঝতে চেষ্টা করল।

ঝড় বৃষ্টির চিন্তার সাথে আরেকটি চিন্তাও যুক্ত হয়েছে তার মনে। তালিকায় তিনটি স্থান থেকে মালামাল নিয়ে আসার জন্য বলা আছে। যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে, সেটার জন্য সংগে করে নিয়ে আসা জলখাবার কম পড়ে যায় কি না সন্দেহ।

মাঝি জোরে জোরে নৌকা বাইতে থাকল।

নৌকার প্রস্থ এমনিতেই কম, তার উপর নদীতে ঢেউ থাকায়, নৌকা দুলতে থাকল প্রবলভাবে।

-আস্তে চালাও মাঝি, আমি সাঁতার জানি না।

বলেই সওদাগর খানিকটা বিরক্ত হল নিজের উপরেই। সাঁতার না জানার ব্যাপার টা এভাবে বলে দেওয়া ঠিক হয় নি।

নিজের দূর্বলতা আপনা-আপনি প্রকাশ করা ঠিক না।

মাঝির মধ্যে অবশ্য তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তবে সে কিছুটা আস্তে আস্তে বৈঠা বাইতে থাকল।

আরো কিছুক্ষণ পর তারা প্রথম ঘাটে পৌছে গেল। সেখানে নামবার সাথে সাথেই কয়েকজন রাজ কর্মচারী এসে এক ঘড়া দামী মদ নৌকায় তুলে দিল।

-আর কিছু আছে নাকি শুধু এটাই? সওদাগর জানতে চাইল।

কর্মচারীরা জানাল যে, শুধু এই ঘড়াটিই তাদেরকে নিয়ে যেতে হবে,

-তাহলে এটা দুজনের মাঝে ভাগ করব কিভাবে?

এ ব্যপারে তারা কিছু জানে না।

বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়ানো গেল না। কারণ বাকি জায়গাগুলিতেও সময়মত পৌছতে হবে এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই ফিরে যেতে হবে।

নৌকা পুনরায় চলতে আরম্ভ করলে সওদাগর বুঝতে পারল যে, দু-জনের মাঝে এই দামী মদ ভাগ করে ফেলা সম্ভব নয়। একজনকে ছাড় দিতেই হবে।

মাঝি জানাল ঘরে তার অজস্র দেনা, এই ঘড়াটি তাকে দিয়ে দিলে বড় উপকার হয়। সওদাগর খানিকক্ষণ ভেবে রাজি হয়ে গেল। ঠিক হল দ্বিতীয় ঘাট থেকে যা পাওয়া যাবে তার সিংহভাগ নেবে সওদাগর।

কিন্তু দ্বিতীয় ঘাট থেকে পাওয়া গেল এক সহস্র রৌপ্যমুদ্রা।

সওদাগরের এখানে সিংহভাগ মুদ্রা পাবার কথা, কিন্তু মাঝি বাধ সাধল। এখানে যে বেশি মূল্যবান জিনিস পাবার কথা, তা তো সে জানত না। মাঝি তাই চাইল গোটা সহস্র মুদ্রা নিজের কাছে রাখতে, আর প্রথম ঘাটে পাওয়া মদের ঘড়া সওদাগরকে দিতে। কারণ অবশ্যই এই যে, মদের মূল্য সহস্র রৌপ্যমুদ্রা থেকে অনেক কম।

সওদাগর খানিকটা বিরক্ত হল, তবে রাজি হয়ে গেল কারণ যে ব্যবসায়িক সুবিধা সে রাজার কাছ থেকে পেতে চায় তার কাছে সহস্র রৌপ্যমুদ্রা অর্থহীন,

কিছুক্ষণ পর আবার দুজনের মধ্যে বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল দুপুরের খাবার নিয়ে। মাঝির দাবি, যেহেতু বৈঠা চালাতে বেশি পরিশ্রম হয়, তাই তাকে খাবারের বেশি অংশ প্রাপ্য।

সওদাগর এর প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল, সে তাই আর বিবাদ না করে মাঝির কথা মেনে নিল। তাছাড়া সে চিন্তা করে বুঝতে পারল, মাঝি খুব ভুল কিছু বলে নাই।

সে বেশির ভাগ সময় শুধু নকশা আর তালিকা নিয়ে বসেই ছিল। মালকড়ি ভাগাভাগ নিয়ে মাঝি স্বার্থপরতা দেখালেও এখানে সে তার ন্যায্য দাবিই তুলেছে। তবে মাঝির আচরণে কর্কশ এবং স্বার্থপর ভাব দেখে মনে মনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল সওদাগর।

জলখাবার এর পর আবার নৌকা চলতে শুরু করল। নীল আকাশে তখন ধূসর মেঘের আনাগোনা। দূরে কোথাও হয়ত বৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত বাতাস বইতে লাগল, তবে বিপদজনক কিছু নয়। তবে তাতেই সওদাগরের বুক টিপটিপ করতে লাগল। বারবার তার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি নৌকা উলটে গিয়ে তার সলিল সমাধি হবে।

নদীতীরের দুপাশে বিস্তীর্ণ সবুজ, কিন্ত প্রকৃতির অপরূপ এই দৃশ্য মন কাড়তে পারল না সওদাগরের।

তাড়াতাড়ি তৃতীয় ঘাট থেকে মালামাল নিয়ে ফিরতে পারলেই বাঁচা যায়।

তৃতীয় জায়গাটি খানিকটা জঙ্গলের ভিতরে, জঙ্গল ঠিক নয়, অপরিচর্যিত বাগান বললেই সুবিধা হয়। আশেপাশে বাড়িঘর আছে, তবে সেগুলি বাগানের বাইরে। নদীর ধারে কিছু বেদে নৌকা বাঁধা আছে, তবে খেয়া নৌকা বা বড় অন্য কোন নৌকা দেখা গেল না।

যেই ঘাটে নৌকা এসে থামল, তার খানিক দূরে এক পুরনো প্রাসাদ, প্রাসাদের ইট খুলে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। ঘাটের পাশেই চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরকে নৌকা থেকে নামার পর বাগানের নারিকেল গাছ থেকে ডাব পেড়ে খাওয়ানো হল। সওদাগরের শরীরটা মনে হল যেন জুড়িয়ে গেল। মাঝি একটি ডাব খেয়ে আরেকটি ডাবের জন্য আবেদন জানালেও লোকগুলোর গম্ভীর চেহারা দেখেই বোধহয় আর বিতণ্ডা করার সাহস করল না।

এরপর ওদের সামনে দুটি কলসি নিয়ে আসা হল। দুটিই স্বর্ণের। রোদের মধ্যে তা একেবারে জ্বলতে লাগল যেন।

-তোমাদের মধ্যে যে বেশি পরিশ্রম করেছে, সে প্রথমে একটি কলসি নির্বাচন করবে। এবং অপর জনকে তা মেনে নিতে হবে। এবং কলসিটি নির্বাচনের আগে ছুঁয়ে দেখা যাবে না।

যেহেতু দুটি কলসিই স্বর্ণের। তাই মাঝির মধ্যে আগে আগে নির্বাচন করার সুযোগের জন্য তেমন আনন্দ লক্ষ করা গেল না।

সে একটি কলসি নির্বাচন করল, অপরটি তুলতে হল সওদাগরকে। তুলবার সময়েই সওদাগর টের পেল, এটা বেশ ভারী, এবং ভেতরে বেশ কিছু বস্তু আছে, মুদ্রার মত।

শুধু সওদাগরই নয়, মাঝিও টের পেল ব্যাপারটা। মাঝির মুখটা পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। তার নিজের হাতে যদিও স্বর্ণের কলসি, কিন্তু তা যে ভেতরে ফাঁকা, তা নিশ্চিত হতে কষ্ট হয় না।

সওদাগরের কলসিটি কিভাবে নেওয়া যায়, সেই চিন্তা করতে লাগল সে।

কলসি দুইটি নৌকায় তোলার পর এবার তারা ফিরতে আরম্ভ করল।

নৌকা যখন মাঝনদীতে পৌঁছে গেছে, তখন মাঝি বৈঠা বাওয়া বন্ধ করল এবং অপর কলসিটি তার কাছে দিয়ে দেওয়ার জন্য সওদাগরের কাছে দাবি করল।

সওদাগর এবার গেল রেগে। সারাদিন মাঝির আচরণে সে কোন প্রতিবাদ করে নি- তাই বোধহয় মাঝির সাহসও খানিকটা বেড়ে গেছে। আর সেই সাহসের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে লোভ।

মাঝি তখনই সওদাগরকে হুমকি দিয়ে দিল যে, কলসিটি যদি মাঝিকে দেওয়া না হয়, তবে সে সওদাগরকে ধাক্কা দিয়ে নদীর পানিতে ফেলে দিবে।

সওদাগর এবার ভয় পেয়ে গেল। যদি সত্যিই এই মাঝনদীতে ডুবে সে মারা যায়- তাহলে কেউ জানতেও পারবে না যে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

অগত্যা সে ভারী কলসিটি মাঝিকে দিয়ে দিতে সম্মত হল।

কলসিটি হাতে পেয়ে মাঝির চক্ষু চকচক করতে লাগল। সে চেষ্টা করল তখনি কলসির ভেতর থেকে রত্ন বের করার। তবে কলসির মুখ এমন শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। যে তা খালি হাতে খুলে ফেলা সম্ভব না।

মাঝি চিন্তা করল পাড়ে গিয়ে একটা দা যোগাড় করে তা দিয়ে বাঁধন কেটে ফেলবে।

ঘাটে ফিরে তারা দেখতে পেল কেউ নেই। মাঝি একটা দা যোগাড় করে এনে কলসির বাঁধন কেটে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মুদ্রা বের করবে, এমন মুহূর্তে চীৎকার। সওদাগর দেখতে পেল কলসি থেকে একটা সাপ বের হয়ে চলে যাচ্ছে।

মাঝির চিতকার শুনে আশপাশ থেকে লোক জড় হয়ে গেল। কেউ একজন মাঝির হাতে শক্ত বাঁধন দিয়ে দিল যাতে বিষ ছড়িয়ে না যায়।

কিন্তু বিধি বাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল মাঝি।

ততক্ষণে কৈলাশ, জিতেন্দ্র নাথ এবং সভাসদের বাকিরাও এসে উপস্থিত হয়েছে। জিতেন্দ্রনাথের চোখে খানিকটা করুণা, কিন্তু কৈলাশ পুলকিত।

-তাহলে লোভের অস্তিত্ব যে সবার হৃদয়ে রয়েছে- এ কথা তো প্রমাণিত হল রাজন।

জিতেন্দ্র নাথ শীতল গলায় বলল- মানতেই হবে কৈলাশ, খেলাটি তুমি সাজিয়েছ নিপুণ হাতে। দরিদ্র মাঝি তোমার ফাঁদে লোভের কারণেই পা দিয়েছে। তবে এখনো দুটি খেলা বাকি। আর আমি নিশ্চিত এ দুটি খেলার ফলাফল আমার বিশ্বাসকেই প্রমাণ করবে।

কৈলাশ রাজার কথা শুনল কি না বোঝা গেল না। তার দৃষ্টি ততক্ষণে সওদাগরের দিকে।

সওদাগর হাসিমুখে তাকিয়ে আছে মাঝির নিথর দেহের দিকে। হয়ত সারাদিনে মাঝির আচরণের পরিণতি দেখতে পেয়ে তার হৃদয় প্রসন্ন হয়েছে।

দ্বিতীয় পরীক্ষা

পরদিন শুরু হল দ্বিতীয় খেলা।

একজন দরিদ্র মাঝবয়েসী বংশীবাদক এবং আরেক ব্যবসায়ীকে নির্বাচন করল কৈলাশ। আগের খেলার মতোই, তাদেরও বিনিময়ে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো।

কিন্তু খেলাটি কি?

প্রত্যেককে আলাদা একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। তাদের পেছনে ভারী দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল সাথে সাথে। ঘরের আবছা আলোতে তারা দেখল: একটি অদ্ভুত তালা, এমন কোন তালা তারা আগে কখনো দেখেনি।

তালাটার পাশে একটি ধারালো ছুরি পড়ে আছে। আর ঘরের এক কোণে, পাঁচ-ছয় বছরের বেশি হবে না এমন একটি শিশু তাদের দিকে নিষ্পাপ চোখে তাকিয়ে আছে।

এরপর, দরজার নিচ দিয়ে প্রতিটি ঘরে একটি করে নির্দেশনা সম্বলিত কাগজ দেওয়া হলো। খেলোয়াড়রা, এখন সত্যিকার অর্থেই বন্দী, সেটি তুলে ধরল, তাদের হৃদপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল যখন তারা সেই লেখাটি পড়ল:

"এই শিশুর পাঁজরের একটি নির্দিষ্ট হাড়ই তোমার মুক্তির চাবি। এই তালাটি শুধুমাত্র সেই বিশেষ হাড় দিয়েই খুলবে। কিন্তু কোন হাড় তা বের করতে হবে তোমাকেই।

যদি তুমি এই কাজটি সম্পন্ন করো এবং সেই চাবিটি ব্যবহার করে বেরিয়ে আসো, তবে তুমি শুধু মুক্তিই পাবে না, তোমাকে অমূল্য ধনরাশি দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে।

মনে রেখো, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীও একই নির্দেশ পেয়েছে। যদি শুধুমাত্র একজন শিশুটির হাড় দিয়ে বন্ধ দরজা খুলে ফেল, তবে সে মুক্তি পাবে কিন্তু বিনিময়ে কোন পুরস্কার পাবে না। যদি দুজনই করো, তবে দুজনই মুক্তি পাবে এবং পুরস্কার পাবে। আর যদি কেউ না করো, তবে তোমরা দুজনেই বিশ বছর এই ঘরে আটকে থাকবে।

তবে, একটি সতর্কতা: যদি তুমি কিছু না করো, এই হাড়টি কয়েক বছরের মধ্যে বড় হয়ে যাবে, এর আকার পরিবর্তিত হবে এবং এটি আর এই তালা খোলার জন্য উপযুক্ত থাকবে না। তখন তুমি বিশ বছর এই ঘরে আটকে থাকবে।

এখন সিদ্ধান্ত তোমার।"

দরিদ্র কয়েদি ঘরে ঢুকে শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইল।

সে ছুরির কাছে গিয়েও ফিরে এল। শিশুর কপালে হাত রেখে বলল, “তুই বড় হ।” তারপর সে নিজে নিজের তালা নাড়তে লাগল—মনে করল কোনো বিকল্প আছে। পরক্ষণেই সে তার বাঁশিটি বের করে আপন মনে তাতে সুর তুলতে শুরু করল।

ধনী কয়েদি কিছু না ভেবে ছুরি তুলল। সামান্য এক শিশুর জীবনের জন্য বিশ বছর নষ্ট করার কোন মানেই হয় না। তাছাড়া সে মনে মনে নিশ্চিত ছিল যে, অপর কয়েদিও শিশুটিকে হত্যার সিদ্ধান্তই নেবে। এক্ষুনি সে ছুরি দিয়ে শিশুটির বুকে আঘাত হানবে এবং তার সমস্ত পাঁজর বের করে ফেলবে।

শিশুর দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক যখন ছুরিটা তুলতে যাচ্ছিল, তখন পুরো ঘর আলোকিত হয়ে উঠল। একটি দেয়াল সরে গিয়ে বেরিয়ে এল জিতেন্দ্রনাথ ও সৈন্যদল।

জিতেন্দ্রনাথ গম্ভীর গলায় বললেন:

"এই শিশুটি সত্যিকারের নয়। ও ছিল এক যান্ত্রিক পুতুল। আর এই ছুরি, নিছক রুপালি। কিন্তু তোমার ইচ্ছেটা ছিল আসল।
তুমি জানলে না কেউ দেখছে, তবুও তুমি হয়ে উঠলে খুনি। কিন্তু সেই দরিদ্র কয়েদি হত্যার বদলে ২০ বছর কারাবাস মেনে নিয়েছে, সেই আসল বীর।"

কৈলাস এবার আর কিছু বলল না। তার অনুমান ব্যর্থ হয়েছে। এক সামান্য বংশীবাদক শিশুটিকে হত্যা না করে বেছে নিল বিশ বছরের বন্দি জীবন?

জিতেন্দ্রনাথের মনে তখন প্রশান্তি। আর সেই ছাপ ফুটে উঠল তার চেহারায়।

-কৈলাশ, এখনো পৃথিবী থেকে মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। আর একটি খেলাতেই আমি আশা করি তা প্রমাণ হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণের মুখ দেখে মনে হল সে বিচলিত নয়। কিন্তু গভীর ভাবনায় আচ্ছন্ন।

তৃতীয় পরীক্ষা

দুদিন পর, তৃতীয় খেলার আয়োজন হলো রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে। বিশাল কক্ষে একটি টেবিল পাতা হলো। টেবিলে রাখা হলো নানারকম খাবার—কিছু সাধারণ, রুক্ষ, স্বাদহীন খাবার যেমন শুকনো রুটি, পাতলা ডাল, আর সেদ্ধ ভাত; আবার কিছু খাবার ছিল সুস্বাদু—তাজা ফলমূল, রসে টইটম্বুর মিষ্টি দই, গোলাপ জামুন, রসগোল্লা, গাজরের হালুয়া, আর নরম লুচি সঙ্গে আলুর দম।

কৈলাশ ঘোষণা করলেন, "এই খেলায় প্রত্যেকে একে একে খাবার ঘরে প্রবেশ করবে। কেউ জানবে না আগের জন কী খেল। শর্ত একটাই—সুস্বাদু খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ। সেটি শুধু অতিথিদের দেখানোর জন্য রাখা হয়েছে। সারাদিনে তিনবার খাবারের ঘরে ঢোকা যাবে। খাবার নিয়ে কেউ কিছু বলবে না, বিশ্বাসই হবে পরীক্ষার ভিত্তি।

কৈলাস খানিকটা হেসে যোগ করল, "মানুষের স্বভাব বুঝতে গেলে তাকে একা রেখে লোভের সামনে দাঁড় করাতে হয়। দেখি কে জয়ী হয়।"

কৈলাশ রাজাকে জানাল যে, সাতদিন চলবে এই পরীক্ষা। প্রথম চারদিন একজন প্রহরী থাকবে। তার কাজ হবে প্রতিযোগীকে সুস্বাদু খাবার খেতে নিষেধ করা। তবে শেষ তিনদিন প্রতিযোগী খাবার খাবে একা। আর কৈলাশের ধারণা এই তিনদিনের মধ্যে একদিন দরিদ্র প্রতিযোগী অবশ্যই সুস্বাদু খাবার মুখে দেবে।

কৈলাশের ধারণাই সত্যি হল। ধনী প্রতিযোগী খাবারের লোভ সামলে ফেলতে পারল সহজেই। কিন্তু দরিদ্রজন ব্যর্থ হল।

রাজসভায় হঠাৎ হৈ চৈ শুরু হলো। দরিদ্র ব্যক্তি বমি করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। চিকিৎসক এসে বললেন, “এদের বিষক্রিয়া হয়েছে রাজন। সুস্বাদু খাবারে যে নিষিদ্ধ বিষ মেশানো ছিল, তা হয়তো কেউ খেয়ে ফেলেছে।”

কৈলাশ শান্ত স্বরে বলল, “এই খেলায় কেউ কাউকে দেখছিল না। কেউ জোর করেনি কিছু খেতে। তারপরও দরিদ্রেরা নিষিদ্ধ খাবারে হাত দিল। এর মানে এই নয় যে ধনীরা ভালো—বরং, যে নিজের লোভ সংবরণ করতে পারে, সেই প্রকৃত নৈতিক। এ পরীক্ষায় দরিদ্রেরা ব্যর্থ হলো।”

রাজা জিতেন্দ্র অবাক হয়ে বলল, “কিন্তু তারা তো জানত না খাবারে বিষ আছে!”

-“সেটাই তো মূল কথা। মানুষের নৈতিকতা বোঝা যায় তখনই, যখন সে ভাবে কেউ দেখছে না। সততা দেখা যায়, যখন প্রলোভনের সামনে দাঁড়াতে হয় একা।”

তিনজনের মধ্যে দু'জন দরিদ্র ব্যক্তি ভুল করেছে, তাই কৈলাশ জয়ী। কথা অনুযায়ী রাজাকে এখন শর্ত পালন করতে হবে।

কিন্তু খেলা শেষ হবার পর জিতেন্দ্র নাথ বেঁকে বসলেন। কোনক্রমেই হয়ত তিনি রমাবতী কে কাছছাড়া করবেন না বলে ঠিক করেছেন। তিনি শেষ খেলায় বিষ মেশানোর ব্যপারটি গোপন রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। তার মতে, বিষের ব্যপার জানলে তো মৃত ব্যক্তি দামী খাবারের লোভ থেকে বিরত থাকত। হাড়ের খেলায় জয়ী ব্যক্তির তিনি খুব প্রশংসা করলেন। এবং পুনরায় আরেকটি খেলার আয়োজন করা উচিত এ কথা বলে দিলেন।

কৈলাশ খানিকটা বিরক্ত হল, কিছুটা নিজের উপর, আর কিছুটা রাজার উপর। আরো একটি খেলার ফলাফল তার দিকে আসলেও জিতেন্দ্র বেঁকে বসতে পারেন। তাই সে কিছুদিন চিন্তার জন্য সময় চাইল।

ভাবতে লাগল সে, কেন সেই ব্যাক্তি শিশুটিকে হত্যা না করার সিদ্ধান্ত নিল।

লোকটার নাম হরেন। পেশায় একজন বংশীবাদক। তবে খুব বেশি প্রতিভাবান নয়। অর্থকষ্ট ছিল এর সারাজীবনের সংগী। স্ত্রী বিগত হয়েছে প্রায় বছর চারেক। ছেলেমেয়ে সবারই বিবাহ হয়ে গেছে। তবে বাপের সাথে কারোরই আর যোগাযোগের সময় নেই। তারা নিজেরা সংসার নিয়েই ব্যস্ত।

এরকম এক লোক বিশ বছর কারাভোগের কষ্ট করতে চাইবে কেন?

ভাবতে থাকল কৈলাশ। কোন মানুষকেই আপাতদৃষ্টিতে সে সৎ মনে করে না। নিশ্চয়ই বংশীবাদকের সততার মধ্যেও কোন একটা কিন্তু আছে।

তবে মহারাজের কাছে এবার যাতে ওর আর তর্ক করতে নাহয়, সেজন্য প্রমাণের বন্দোবস্ত করে ফেলল। সে গুপ্তচর নিয়োগ করে দিল বংশীবাদকের পেছনে।

কিছুদিনের মধ্যেই কৈলাশের পাতা ফাঁদে পুনরায় পা ফস্কে গেল বংশীবাদকের। একেবারে প্রমাণ সহিত রাজার সামনে উপস্থিত হল কৈলাশ।

-রাজন, আমাদের নিরীক্ষণের ফলাফল পুনরায় নির্ধারণ করা প্রয়োজন

-সে কি কৈলাশ, তোমাকে তো বলেছি, খেলার মধ্যে খানিকটা অসমতা ছিল। তাছাড়া বংশীবাদকের স্বার্থহীন আচরণ, বাকি দুইজনের স্বার্থপরতার তুলনায় অনেক বেশিই মূল্যবান।

-কিন্ত রাজন, আমি প্রমাণ করতে পারি যে, বংশীবাদকের আপাতদৃষ্টিতে স্বার্থহীন আচরণ আসলে অতি কদাকার এক উদ্দেশ্য কে আড়াল করে মাত্র।

-এ কী বলছ কৈলাশ।

-হ্যা, রাজন। প্রথম প্রথম আমিও বংশীবাদককে অনেক শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু পরে ব্যপারটি নিয়ে অনেক ভেবে দেখলাম। চিন্তা করুন রাজন। এই তিন নিরীক্ষণে যারা লোভের ফাঁদে পা দিয়েছে তাদের লোভের কারণ কি ছিল?

-প্রথম জনের সম্পদ, দ্বিতীয় জনের স্বাধীনতা, আর তৃতীয় জনের তার নিজের জিহবার স্বাদ।

-কিছুটা ঠিক, তবে ভাবুন রাজন। দ্বিতীয় খেলাটিতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ২০ বছরের জন্য কারাভোগের দু:স্বপ্ন ধনী লোকটির নৈতিকতা হ্রাস করেছে।

-ঠিক

-কিন্তু বংশীবাদকের ক্ষেত্রে কারাভোগ মোটেই দু:স্বপ্ন হত না।

-সেটা কিভাবে হয়, কৈলাশ?

-সেই বদ্ধ কামরা আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এক নরক, কিন্তু পৃথিবীতে বিকৃত রুচির অনেক মানুষ আছে, এদের জন্য আনন্দের প্রধান উপাদান অন্য আরেকটি শরীর। সেই শরীর কোন শিশুরই হোক না কেন।

জিতেন্দ্রনাথের চোখ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

-আমি বংশীবাদকের অতীত সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজ নিয়েছি রাজন। তাছাড়া কয়েকদিন আগে তাকে প্রমোদপল্লিতে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। সেখানকার কোন রমণীকে তার মনে ধরে নি, বরং সে খোঁজ করেছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের। তার পিছনে আমি গুপ্তচর নিয়োগ দিয়েছিলাম সন্দেহ হওয়ায়। আর সেই সন্দেহই সত্যি প্রমাণিত হয়।

জিতেন্দ্রনাথ তক্ষুনি তরবারি হাতে বের হয়ে পড়লেন।

তার মন থেকে দরিদ্রের প্রতি সমস্ত স্নেহ কর্পূরের মত উবে গেছে। কৈলাশ সেটা আঁচ করতে পারল খুব সহজেই।

তবে এক্ষুনি হয়ত রমাবতীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে আরেকটি বিয়ে করবার কথা বলা ঠিক হবে না। কবে নাগাদ বলা যায়, সেটিই ভাবতে থাকল কৈলাশ।